যুগান্তর

তারিখ · 04 DEC 2017
পৃষ্ঠা 20 কলাম 6

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার হাল

স্কুলে লেখাপড়া হয় মাত্র ৪০ শতাংশ

মুসতাক আহমদ

প্রাথমিক স্কুলগুলোয় শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার মাত্র ৪০ শতাংশ পূরণ করা হয়। বাকি ৬০ শতাংশই নির্ভর করে শিক্ষার্থীর ওপর। অথচ উন্নত বিশ্বে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনে স্কুলের ভূমিকাই ৭০ শতাংশ। শিক্ষার্থীর কার্যক্রম বা উপাদানের ভূমিকা সেখানে মাত্র ৩০ শতাংশ। খোদ সরকারি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য ওঠে এসেছে।

'জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন' (এনএসএ) শীর্ষক ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমন ভূমিকার কারণে ছাত্রছাত্রীরা ঠিক মতো শিখছে না। শিক্ষার মানও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেই। এমন বাস্তবতায় প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়াতে শিক্ষক ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের আরও সক্রিয় করার উদ্যোগ নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর অংশ হিসেবে শিক্ষক ও কর্মকর্তারা ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি যাবেন। তারা সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর বাড়িতে উঠান বৈঠক করবেন। বৈঠকে শিক্ষার্থীর সমস্যা অভিভাবককে অবহিত করার পাশাপাশি নিজেরাও জেনে আসবেন। সে অনুযায়ী সাজানো হবে স্কুলের পাঠদান পরিকল্পনা। মূলত শিক্ষার্থীর শিখন মান উন্নয়নে অভিভাবকরাও বড় ভূমিকা রাখতে পারেন— এমন প্রত্যাশা থেকেই সরকার এ পদক্ষেপ নিচ্ছে।

শিক্ষার্থীরা শ্রেণী অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষা পাচ্ছে না

লেখাপড়ার মান বাড়াতে বাড়ি বাড়ি যাবেন শিক্ষক-কর্মকর্তারা

স্কুলকে 'চাইল্ড কেয়ার হোম' রূপে গড়ে তোলা লক্ষ্য

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ এ প্রসঙ্গে যুগান্তরকে বলেন, 'এনএসএ প্রতিবেদনের আলোকে মনে হচ্ছে, স্কুলগুলোর দিকে আমাদের আরও নজর দেয়া দরকার। ওই প্রতিবেদনে বেশকিছু সুপারিশ করা হয়েছে। সেসব সামনে রেখেই শিক্ষক, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের জন্য কিছু করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে আমরা তার বাস্তবায়ন কাজ শুরু করে দিয়েছি। একেকটি স্কুলকে চাইল্ড কেয়ার হোম রূপে গড়ে ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

স্কুলে লেখাপড়া হয় মাত্র ৪০ শতাংশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তোলাই সরকারের লক্ষ্য।'

মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, গত বছরের শেষদিকে প্রকাশিত এনএসএ প্রতিবেদনে তৃতীয় এবং পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বাংলা ও গণিতে অর্জিত মান দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, তৃতীয় শ্রেণীতে বাংলা বিষয়ে ৩৫ শতাংশ শিক্ষার্থীর শিখন মানই নিম্ন। অর্থাৎ, তৃতীয় শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থীর যতটুকু শিখন মান অর্জনের কথা তা হয়নি। বাকি ৬৫ শতাংশের মান সন্তোষজনক। তবে একই শ্রেণীতে গণিতে ৫৭ শতাংশের মানই নিম্ন। অপরদিকে পঞ্চম শ্রেণীতে বাংলায় ৭৭ এবং গণিতে ৯০ শতাংশের মান নিম্নপর্যায়ে আছে।

এর আগে ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের শিশুদের শিখন মানের ওপর একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণীর মাত্র ২৫ শতাংশ শিশু বাংলায় এবং ৩৩ শতাংশ গণিতে প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন করতে পারছে। অর্থাৎ এ দুই বিষয়ে যথাক্রমে ৭৫ ও ৬৭ শতাংশ শিশু ভালোভাবে শিখছে না। ওই বছরই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি) অধীন গাজীপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি বেজলাইন সার্ভে পরিচালনা করা হয়। সার্ভেতে দেখা যায়, তৃতীয় শ্রেণীর মাত্র ২৫ ভাগের কম শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে বাংলা পড়তে পারে। গণিতের অবস্থাও একই রকম। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিখন মানও প্রায় অভিন্ন।

এপ্রসঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সাবেক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের (ক্যাম্পে) নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'সরকারি-বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার গবেষণায় প্রমাণিত যে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে। এরআগে আমাদের ২০১৫ সালে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে- প্রাথমিক শিক্ষা কোচিং নির্ভর হয়ে পড়েছে। অবৈতনিক হলেও তাতে খরচ বেড়েছে অনেক। আসলে শ্রেণিকক্ষে লেখাপড়া না হলে সেখানে মানের আশা করা যায় না।' তিনি বলেন, 'সরকার উঠান বৈঠক করতে চায়। হয়তো আরও অনেক পদক্ষেপ নেবে শিক্ষার মানের জন্য। কিন্তু চারটি কাজ না করলে যত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নেয়া হোক কোনো লাভই হবে না। শিক্ষক নিয়োগ দিয়েই ক্লাসরুমে পাঠানো বন্ধ করতে হবে। ন্যূনতম প্রাক-প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় সরকারে দিতে হবে। কেননা, কোন শিক্ষক দুর্বল আর কোথায় লেখাপড়া হয় না, তা কেন্দ্র থেকে জানা ও ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব নয়। শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ায় এই খাতের বরাদ্দ সর্বনিম্ন। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শিক্ষকের ক্যারিয়ার পাথ সৃষ্টি। একজন সহকারি শিক্ষকের যদি দক্ষতা, যোগ্যতা আর অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে তিনি কেন অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালক হবেন না?'

মন্ত্রণালয়ের এক নথিতে দেখা যায়, শিক্ষার মান ও পরিস্থিতি নিয়ে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে ১১টি উদ্যোগের মাধ্যমে স্কুলেই শিক্ষার্থীর শিখন মান উন্নয়ন করতে চায় সরকার। এগুলো হচ্ছে— শিক্ষকের পূর্বপ্রস্তুতিসহ ক্লাস রুমে পাঠদান। পাঠদানে সুন্দর ও আকর্ষণীয় উপকরণ ব্যবহার। নিয়মিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও সহশিক্ষা কার্যাবলি পরিচালনা। পাঠদানে বৈচিত্র্য আনা এবং একই পাঠ শিশুদের উপযোগী করে আলাদা পদ্ধতিতে দেয়া। প্রয়োজনে একই পাঠ কয়েকবার দেয়া। স্কুলকে আরও আকর্ষণীয় করা। একেকটি স্কুল 'চাইল্ড কেয়ার হোম' রূপে গড়ে তোলা। স্কুলে মিড ডে মিল শতভাগ বাস্তবায়ন করা। স্কুলে পাঠদানের সময় বাড়ানো এবং দুই শিফটের স্কুল এক শিফটে রূপান্তর। এসব কাজে স্কুলকে প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে এসএমসি এবং শিক্ষা কর্মকর্তারা সহায়তা করবেন। প্রয়োজনে মন্ত্রণালয় বিধিবিধানে সংশোধন এনে আদেশ-অনুশাসন জারি করবে।

এ ব্যাপারে অতিরিক্ত সচিব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমাদের শিক্ষকদের যোগ্যতা কম নয়। কিন্তু এরপরও শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে শিখছে না, সেটাই চিন্তার বিষয়। এ কারণেই আমরা স্কুলের ভেতরে জোর দিচ্ছি। অভিভাবকদেরও সচেতন করব। বর্তমানে সারা দেশে ১৩ হাজার স্কুল আছে দুই শিফটের। কিন্তু সেগুলো চাইলেই এক শিফটের করা যায় না। এজন্য অবকাঠামোগত সুবিধা বাড়ানো প্রয়োজন। এরজন্য যে অর্থের দরকার হবে তা আমরা পিইডিপি-৪ থেকে সংস্থান করব।'

জানা গেছে, এনএসএ গবেষণা প্রতিবেদনে স্কুলের ক্লাস রুমের অবস্থা, শিক্ষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা, কর্মকর্তাদের মনিটরিংসহ বিভিন্ন দিক ওঠে এসেছে। এতে শিক্ষার্থীর শিখন মান উন্নয়নের পেছনে মোটা দাগে ১২টি ঘাটতি চিহ্নিত হয়। এনএসএ প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রত্যেক স্তরেই শিক্ষার্থীর শিখনে ঘাটতি থাকছে। এমন দৃষ্টান্তও আছে, শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো বাংলা বর্ণ চিনতে পারে না। এ কারণে শিশুদের প্রথমেই ভালোভাবে বর্ণ এবং যুক্ত বর্ণ চেনানোর ওপর জোর দেয়া হয়েছে প্রতিবেদনে।

বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতাভিত্তিক কারিকুলামে লেখাপড়া করানো হয়। তবে মূল্যায়ন করা হয় সৃজনশীল পদ্ধতিতে। এতে পঠন যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থী মূল্যায়নে তিনটি দিক দেখা হয়। তা হচ্ছে— জ্ঞানীয় স্তর, অনুধাবন ও প্রয়োগমূলক দিক। এর মধ্যে প্রথমটিতে শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। বাকি দুটিতে ভালো ফল অর্জন করতে পারছে না।

নাম প্রকাশ না করে শিক্ষক এবং মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা জানান, প্রাথমিকে গত কয়েক বছর আগে সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। পঞ্চম শ্রেণীর পিইসি পরীক্ষায় ১৫ শতাংশ প্রশ্ন সৃজনশীল পদ্ধতিতে করা শুরু হয়। সর্বশেষ এবারের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষায় সর্বসাকুল্যে ৮০ শতাংশ প্রশ্ন ছিল এ পদ্ধতিতে। শিক্ষার্থী মূল্যায়নে এত বড় পরিবর্তন আনা হলেও শিক্ষকদের এ ব্যাপারে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে উপযুক্ত করা হয়নি। সর্বসাকুল্যে ১০ শতাংশ শিক্ষক (তাও তরুণ) এ পদ্ধতি বোঝেন। গোড়ায় এমন গলদ থাকায় শিক্ষার্থীর পাঠদান থেকে শুরু করে মূল্যায়ন— কোনোটিই ঠিকমতো হচ্ছে না। উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে এনএসএ প্রতিবেদনে ১১টি পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করা হয়।

সাধারণত একই শ্রেণীতে একজন শিক্ষক নির্দিষ্ট বিষয়ে পাঠদান করে থাকেন। তা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীর শিখন মান একই রকম হয় না। মান কাছাকাছি আনতে শিশুদের উপযোগী করে একই পাঠ বিভিন্নভাবে দেয়া; সবল-দুর্বল শিক্ষার্থীর বসার ব্যবস্থা করা; পারগ-অপারগ শিক্ষার্থী সমন্বয়ে দল গঠন করে শিখন-শেখানো কাজ সম্পন্ন করা এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজ নিয়মিত রাখা।

কার্যালয়
প্রশাসনিক কর্মকর্তা